নারীবাদ, হিজাব ও বিজ্ঞান

ড. আহমদ আবদুল কাদের

Academia Publishing House Ltd

Academia Publishing House Ltd

নারীবাদ, হিজাব ও বিজ্ঞান

ড. আহমদ আবদুল কাদের

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫

পরিবেশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (তৃতীয় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মূল্য
টাকা ৩০০.০০, US$ 10

প্রচ্ছদ
আব্দুল্লাহ আল মারুফ

আইএসবিএন
978-984-35-7408-4

Feminism, Hijab and Science by Dr. Ahmed Abdul Quader, Published by Academia Publishing House Limited (APL) 253/254, Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Elephant Road, Dkaha-1205, Bangladesh, Cell: +880 01400403954, 01400403958, E-mail: aplbooks2017@gmail.com, Publishing year 2025, Price: Tk.300 / $10

সূচি

লেখকের কথা ৫

প্রথম অধ্যায়: নারীবাদ

নারীবাদ : সংজ্ঞা ও ধারণা ৭

নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ৮

পাশ্চাতে নারীদের অবস্থা যেমন ছিল ৮

নারীবাদের উন্মেষ ৯

নারীবাদের ঢেউ ১০

নারীবাদী আন্দোলনের ধারা ১৪

নারীবাদী আন্দোলন কার্যত ঔপনিবেশিক মানসিকতাপুষ্ট আন্দোলন ১৫

নারীবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সামাজিক মনোভাব ১৭

নারীবাদী আন্দোলন একটি এলিটধর্মী আন্দোলন ১৮

নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারীবাদ ও বিজ্ঞান

নারী-পুরুষে পার্থক্য প্রাকৃতিক নয়, বরং সমাজসৃষ্ট ২৫

বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নারী-পুরুষে পার্থক্য ২৬

নারী-পুরুষের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসমূহের সারসংক্ষেপ ৭১

উপসংহার ৯০

তৃতীয় অধ্যায়: শালীন পোশাক বা হিজাব

শালীন পোশাকের ধারণা ৯১

বিভিন্ন ধর্মে নারীদের শালীন পোশাক ৯৩

হিজাব বিরোধী ঔপনিবেশিক প্রকল্প ৯৯

মহিলাদের পোশাক: অতীত ও বর্তমান ১০৩

মুসলিম বিশ্বে হিজাব ও নেকাব ১০৬

অমুসলিম দেশে হিজাব ও নেকাব ১১৫
ইরানী বিপ্লব ও হিজাব ১১৮
তুরস্কে হিজাববিরোধী আইন বাতিলের সংগ্রাম ১২১
হিজাব বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা ১২৬
নারীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও নিরাপত্তায় হিজাব ১২৭

পরিশিষ্ট ১: হিজাববিষয়ক আয়াত ১৩১

পরিশিষ্ট ২: হিজাববিষয়ক হাদিস ও আছার ১২৫

পরিশিষ্ট ৩: হিজাবের সীমা: ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের অভিমত ১৪৭

লেখকের কথা

নারীবাদ আজকের যুগের একটি ফ্যাশন। এটি নারীর অধিকার রক্ষার কথা বলে শুরু হলেও সময়ের ব্যবধানে এটি কার্যত পুরুষবিরোধী একটি শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। নারী-পুরুষের পার্থক্য মুছে দিয়ে এটি ক্লীবলিঙ্গধর্মী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বিরাজমান পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং তাদের প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনকে বাদ দিয়ে ক্লীবলিঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে নারীবাদ। আধুনিক বিজ্ঞান এহেন নারীবাদী তত্ত্বকে নাকচ করেছে। বিজ্ঞান এ জাতীয় প্রকৃতিবিরোধী অস্বাভাবিক তত্ত্ব সমর্থন করে না। তাই প্রাকৃতিক নিয়ম যে নির্দেশনা দেয়, তারই আলোকে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে সমাজ গড়ে তুলবে। মানবজাতিকে সমন্বয়ধর্মী সমাজ গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। তা না করে যদি সমন্বয়কে পরিহার করে একপেশে তত্ত্ব দিয়ে সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, তাহলে এটি হবে মানবতার জন্যে ধ্বংসের খাদ খনন। তাই আমাদের সমাজের দুই প্রধান অংশকে গুরুত্ব দিয়ে সবার দায়দায়িত্ব মেনে নিয়ে সমাজ নির্মাণ করতে হবে। তাহলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হবে। অন্যথায় বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য সমাজকে কুরে কুরে খাবে। আমি এ গ্রন্থে এটি প্রমাণের চেষ্টা করেছি।

হিজাব ইসলামের একটি আবশ্যিক বিধান। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটি কুরআন দ্বারা নির্দেশিত। প্রত্যেক মুসলিমকেই এর গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য থাকলেও হিজাবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সব ধর্মেই নারীদের শালীন পোশাক পরিধানের কথা বলা হয়েছে। তবে আধুনিক যুগে নারীদের শালীন পোশাক বা হিজাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বিশেষত মুসলিম বিশ্বে হিজাবের অবস্থান নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া হিজাবের সীমা সম্পর্কে যেসব মতবিরোধ আছে, তাও আমরা এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে আলোকপাত করেছি। এমনকি সকল মাজহাব-মসলকের প্রতিনিধিত্বশীল পণ্ডিতদের হিজাববিষয়ক মতপার্থক্য তুলে ধরেছি।

কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই আমার এ গ্রন্থেও ভুলত্রুটি থাকতে পারে পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং সঠিক কথা অনুধাবনের তওফিক দিন-আমিন।

৩ জানুয়ারি ২০২৫

আহমদ আবদুল কাদের
৮বি সাঁঝের মায়া, ৩১/১ পশ্চিম আগারগাঁও
শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

প্রথম অধ্যায়

নারীবাদ

বর্তমান পৃথিবীতে নারীবাদী আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। নারীবাদীদের অনেক দাবি বিভিন্ন দেশের সরকার মেনে নিয়েছে। এ আন্দোলন প্রথমে পাশ্চাত্যে শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে মুসলিম বিশ্বসহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামপন্থীগণ নারীবাদী আন্দোলন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন। আবার নারীবাদীরাও ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে একইরূপ নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। তাই নারীবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী(?) এবং কোন ধরনের নারীবাদ গ্রহণযোগ্য, কোন ধরনের নারীবাদ প্রত্যাখ্যানযোগ্য– এ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জানা প্রয়োজন। আর তা জানতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন নারীবাদ বলতে কী বোঝায়? নারীবাদী আন্দোলনের ফলাফল কী? নারীবাদের রকমফের আছে কি না? আমরা প্রথমে নারীবাদের ধারণা, লক্ষ্য, পটভূমি, উন্মেষ, পর্যায়, রকমফের, নারীবাদ সম্পর্কে সেক্যুলার-সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করব। তারপর এসব বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নারীবাদ: সংজ্ঞা ও ধারণা

বিভিন্ন অভিধান ও ইনসাইক্লোপিডিয়া বিভিন্নভাবে নারীবাদের সংজ্ঞা দিয়েছে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

ম্যারিয়াম ওয়েবস্টার-এর মতে, 'পুরুষের মতো নারীকেও সমান অধিকার ও সুযোগ দান করা উচিত এমন বিশ্বাসই নারীবাদ।'[১]

উইকিপিডিয়ার মতে, 'নারীবাদ হচ্ছে একটি ভাবাদর্শিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারসাম্য সৃষ্টি।'[২]

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে, 'নারীবাদ হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমতায় বিশ্বাস।'[৩]

---

১ Marriam Webstat, Feminism

২ Wikipedia, Feminism

৩ Encyclopedia Britanica, Feminism

অর্থাৎ, নারী-পুরুষ এক ও অভিন্ন; তাদের অধিকারও এক ও অভিন্ন। তাই তাদের সুযোগ-সুবিধাও পুরুষের মতো হতে হবে। আর এসব অধিকার অর্জনের আন্দোলনই নারীবাদী আন্দোলন বলে পরিচিত।

নারীবাদের উদ্ভব পাশ্চাত্যে হলেও সারা দুনিয়ায় এটি ছড়িয়ে পড়েছে। নারীবাদীরা সর্বত্র নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবিদার।

নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য

অনেকগুলো লক্ষ্য নিয়ে নারীবাদীরা কাজ করছে। বিশেষত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভের অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও বেতন লাভ, মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করা, নারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, বিয়ের ক্ষেত্রে সমানাধিকার, মাতৃকালীন ছুটি লাভ, পারিবারিক সহিষ্ণুতা, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ থেকে নারীকে রক্ষার আইনগত প্রতিবিধান ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে আরও কিছু বিষয় নারী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। যেমন: নারীর যেকোনো পোশাক পরার অধিকার, নারীর যৌন স্বাধীনতা ও সন্তান ধারণ করা বা না করার স্বাধীনতা, নারী-পুরুষ নিরপেক্ষ ভাষা প্রয়োগ, কর্মবণ্টনের ক্ষেত্রে সমাজে কিছু কাজ পুরুষসুলভ ও কিছু কাজ নারীসুলভ এ ধারণার অবসান ইত্যাদি। এককথায়, পুরুষের মতোই যাবতীয় অধিকার অর্জন করাই নারীবাদের লক্ষ্য।

পাশ্চাত্যে নারীদের অবস্থা যেমন ছিল

প্রায় সতেরোশ' বছর ধরে পাশ্চাত্য খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান গ্রন্থ বাইবেল। এই বাইবেলের পুরাতন (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বিধান অনুযায়ী গ্রিক-রোমান সংস্কৃতি ও সমাজে (নিউ টেস্টামেন্ট এর সময়ে) বিয়েসহ সামাজিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্র পরিচালনা সবকিছুতে পুরুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিল। বাইবেলের মতে, 'শাসন স্বামীর হাতে থাকবে। খোদার নির্দেশবলে স্বামীকে মান্য করতে স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে। স্বামী গৃহে ও রাষ্ট্রে সর্বত্র শাসনকার্য পরিচালনা করবে, পুরুষরা যুদ্ধবিগ্রহ করবে এবং সবকিছুর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তার ওপর থাকবে। নারীরা ঘরে বসে থাকবে, সে তার একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না'।[৪] প্রকৃত কথা হচ্ছে, নারীর

৪ লুথার লেকচার

কাজ হচ্ছে পুরুষের সঙ্গ দেওয়া, যাতে সে নেতৃত্ব, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অগ্রবর্তী হতে পারে।'[৫]

'আদি পুস্তক অনুযায়ী পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই নারীদের অবস্থান পুরুষদের নিচে। স্রষ্টার প্রতিবিম্ব পুরুষদের ওপর নারীদের চেয়ে অতি উজ্জ্বলতরভাবে আপতিত হয়েছে।'[৬]

খ্রিষ্টধর্ম অনুযায়ী নারীরা পাপের আধার। 'আদি পাপের' জন্য নারীই দায়ী। তাই নারী ধর্মীয়ভাবেই ছিল নিম্নশ্রেণির, দুষ্ট, পাপীয়সী। কালে কালে নারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে পুরুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে। নারীসঙ্গ পুরুষের জন্য বরাবরই ক্ষতিকর বিবেচনা করা হয়েছে। তাছাড়া সামাজিকভাবেও নারীদের তেমন কোনো মর্যাদা প্রদান করা হয়নি।

গোটা মধ্যযুগে বাইবেল ও পাদ্রীদের মতামতকে ভিত্তি করেই খ্রিষ্টীয় সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ১৯ শতক পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল যদিও তা ছিল ভাঙনের মুখে। সমগ্র পাশ্চাত্যের ইতিহাসে নারীরা শুধু গৃহস্থালী কাজেই আবদ্ধ ছিল। আর পুরুষরা ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজে নিয়োজিত। মধ্যযুগে ইউরোপে নারীদের সম্পত্তির অধিকারী হওয়া, লেখাপড়া শেখা অথবা জনজীবনে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ বা অধিকার ছিল না। ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে জনসম্মুখে মহিলাদের মাথা ঢাকতে বাধ্য করা হতো। জার্মানীর কোনো কোনো অঞ্চলে স্ত্রীকে বিক্রয়ের অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ইউরোপে নারীদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না অথবা কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ারও অধিকার ছিল না। নারীরা তার পুরুষ প্রতিনিধি (স্বামী, পিতা বা পুত্র) ছাড়া কোনো ব্যবসায় জড়িত হতে পারতো না।

নারীবাদের উন্মেষ

ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট-এর যুগ হচ্ছে নারীবাদের প্রাথমিক উন্মেষের সময়। এ যুগটি হচ্ছে ১৭ ও ১৮ শতক। এ সময়েই নারীদের অধিকারবিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। নারীরা তখন বহুল উচ্চারিত স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রাকৃতিক অধিকার নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে দাবি জানাতে থাকেন।

৫ কার্ল বার্থ, চার্চ ডগমেটিকস

৬ Woodhead, Linda (2004). Christianity: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. pp. n.p.

এ যুগের প্রথম দিকের দার্শনিকরা সামাজিক শ্রেণি, বর্ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজমান অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন। কিন্তু নারীদের প্রতি কৃত অন্যায়কে তারা উপেক্ষা করেন। তদানীন্তন ফরাসী দার্শনিক রুশো মন্তব্য করেন যে, 'নারীজাতি হচ্ছে নির্বোধ এক সৃষ্টি, তাকে গভীরভাবে বিবেচনার কোনো প্রয়োজন নেই।' অধিকন্তু ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর মানবাধিকার ঘোষণায় *(Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)* নারীদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঐ সময়কার নারী বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখান। ১৭৯১ সালে একজন বিখ্যাত নাট্যকার অলিম্পিক দ্যা গজ 'নারী ও (নারী) নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণা' প্রকাশ করেন। সেই ঘোষণায় বলা হয় যে, 'নারী শুধু পুরুষদের সমানই নয়, বরং তারা হচ্ছে পুরুষের সমঅংশীদার।' ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডে আর একটি যুগান্তকারী বই প্রকাশিত হয়। লেখিকা হচ্ছেন উলস্টোনক্র্যাফ্ট। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যে, 'পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যই নারীর অস্তিত্ব, এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। তিনি প্রস্তাব করেন যে, শিক্ষা, কাজ ও রাজনীতিতে মহিলা ও পুরুষদের সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। তিনি আরও লেখেন যে, প্রকৃতিগতভাবেই নারীরা পুরুষদের মতোই বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার অধিকারী। নারীরা যদি নির্বোধ হয়ে থাকে, তার কারণ সমাজই তাদের নির্বোধ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

নারীবাদের ঢেউ

নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ঢেউ

নারীবাদের প্রাথমিক উন্মেষ ফরাসী বিপ্লবের পরপরই ঘটলেও এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ১৮৪৮ সালের জুলাই মাসে। সেদিন নিয়র্ক রাজ্যের ছোটো শহর সেনেকা ফলসে প্রথম বারের মতো নারী অধিকারবিষয়ক এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনশত নারী-পুরুষ অংশ নেয়। সেখানে নারী ভোটাধিকারসহ ১১ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বলা হয় যে, পুরুষ ও নারীকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কনভেনশনের চূড়ান্ত ঘোষণায় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় যে, সমস্ত যাজকীয় মঞ্চ থেকে পুরুষের একচেটিয়ার অধিকার ছুড়ে ফেলতে হবে, ব্যাবসাবাণিজ্য ও সবধরনের পেশায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সমঅধিকার দিতে হবে। এই কনভেনশনের অনুকরণে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে আরও কিছু নারী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে নারী অধিকার আন্দোলন কার্যত স্থগিত হয়ে যায়। সেই সময়ে ইউরোপেও সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রচণ্ড চাপ ও অত্যাচার বেড়ে

যায়। এরপর নারীবাদী আন্দোলন যখন আবার শুরু হয়, তখন নারী ভোটাধিকারের দাবিটাই প্রধান দাবি হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ৭০ বছর ধরে নারী ভোটাধিকারের দাবিটাই আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের মূল দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর নারীবাদীদের আশা ছিল যে, নারী ভোটাধিকার সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর (যাতে বর্ণের ভিত্তিতে ভোটাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু কার্যত তেমন কিছু হয়নি। ফলে নেতৃস্থানীয় নারীবাদী স্টেনটন এবং সুসান বি অ্যান্থনি ১৮৬৯ সালে জাতীয় নারী ভোটাধিকার এসোসিয়েশন *(National Woman Suffrage Association)* প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে তারা আন্দোলন চালাতে থাকেন। প্রথম দিকে তাদের মূল যুক্তি ছিল প্রাকৃতিক অধিকারের ভিত্তিতেই নারী-পুরুষের সমান ভোটাধিকার পাওয়া উচিত। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে যে মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেই হিসেবে নারী-পুরুষনির্বিশেষে আমেরিকাবাসী সমস্ত নাগরিকের ভোটাধিকার পাওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাদের দাবি মানা হচ্ছিলো না। ১৯০০ সালের মধ্যে আমেরিকায় পূর্ব ইউরোপের অভিবাসীদের স্রোত বন্যার মতো বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে নগরে নগরে অভিবাসী অধ্যুষিত অনেক বস্তি গড়ে ওঠে। তখন নারীবাদীরা সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি বাদ দিয়ে বর্ণবাদের ভিত্তিতে বস্তির ভোটাধিকারের মোকাবিলায় আমেরিকার শিক্ষিত নারীদের ভোটাধিকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি জানাতে থাকেন। ১৮৯৪ সালে ক্যারি চাপম্যান ক্যাট ঘোষণা করেন যে, আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীদের ভোট বিদেশীদের ভোটকে ব্যালেন্স করবে। বস্তিবাসীর ভোটকে মোকাবিলা করতে হলে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী নারীদের ভোটাধিকার দিতে হবে। কিন্তু তাদের দাবি তখনও পূরণ হলো না।

অন্যদিকে ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে নারী-ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন ১৯০৩ সালে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ অনুভব করেন যে, শুধু লবি করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের দাবি পূরণ হবে না। তাদেরই এক বিপ্লবী গোষ্ঠী *Emmeline Pankhurst* নেতৃত্বে সহিংস আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে। বয়কট, পিকেটিং, বোমাবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে পরিস্থিতিকে অগ্নিময়, সংঘাতময় করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ৩০ বছরের বেশি বয়সের গৃহের মালিক, গৃহের মালিকের স্ত্রী ও স্নাতক পাশ করা নারীকে ভোটাধিকার দিতে বাধ্য হয়।

সেই সূত্র ধরে আমেরিকাতে ১৯২০ সালে নারী-ভোটাধিকার অনুমোদন করে সংবিধানের ১৯তম সংশোধনী গৃহীত হয়। এতে রাজনীতির ক্ষেত্রে বৃটেন ও আমেরিকায় নারীদের একটি বড়ো ধরনের বিজয় অর্জিত হয়।

নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় ঢেউ

১৯৬০-এর দশকে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ১৯২০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ভোটাধিকার অর্জিত হওয়ার পর নারীবাদী আন্দোলন কার্যত স্তিমিত হয়ে পড়ে। এমতবস্থায় নারীবাদী আন্দোলন অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে, অনেক নারীবাদী নারী-পুরুষের ঠিক একই ধরনের সমতায় বিশ্বাসী ছিল না। তারা কেউ চাচ্ছিলো নারীদের জন্য বিশেষ আইন, যার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকতে পারে এবং যাতে মহিলারা সরাসরি উপকৃত হতে পারে। আবার অন্যরা চাচ্ছিলো নারীদের আরও অধিকার। প্রশ্ন দেখা দিলো : নারীবাদের লক্ষ্য কী হবে? এটা কি পূর্ণ সমতা, না নারীদের প্রয়োজন পূরণ? কর্মজীবী মহিলারা চাইলো এমনসব আইন, যা তাদের সুরক্ষা দেবে। ট্রেড ইউনিয়নের নারী সদস্যরা দাবি করলো এমনসব আইনের, যা তাদের সহায়তা করবে। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীরা বর্তমান সুরক্ষা, সুযোগ-সুবিধার কথা না বলে সব ব্যাপারে পুরুষের মতো সমতা দাবি করলো। ১৯৬০-এর দশকে প্রধান ধারার নারীবাদীরা আইনগত সমতার জন্য প্রচারণা শুরু করে। তারা বিভিন্ন দাবিতে (যেমন, কলেজের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে মহিলা লেখকদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মহিলাবিষয়ক বিভিন্ন বিভাগ চালু করা, মিস বা মিসেস শব্দের পরিবর্তে *Ms* এর মতো লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করা ইত্যাদি) আন্দোলন আরম্ভ করে।

তাদের আন্দোলনের ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'নারী অধ্যয়ন বিভাগ' খোলা হয়, নারীদের জন্য সংরক্ষিত অনেক কিছুর পরিবর্তন করে নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ফলে নারীরা পুরুষের একচেটিয়া ক্ষেত্রগুলোতে চাকুরি পেতে শুরু করে। নারীরা পাইলট, বাস ড্রাইভার, নির্মাণশিল্পের কর্মী, সৈনিক, ব্যাংকার ইত্যাদি হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় ঢেউ

নারীবাদের তৃতীয় ঢেউ বিশ শতকের ৯০-এর দশকের মধ্যভাগে শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন নারীদের ব্যাপক পেশাগত অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নের

পথ প্রশস্ত করে। তদুপরি নারীদের যৌনবিষয়ক স্বাধীনতা অনেকটা অর্জিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে সেই যৌন স্বাধীনতাকে আরও অবাধ করা, নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত যেসব ধারণা বিরাজমান-যেমন: নারী দুর্বল, নিষ্ক্রিয়, অধীনতাপ্রিয়, ভীরু, পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ইত্যাদির বিরোধিতা করে নারী যে শক্তিশালী, সাহসী, নিজের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম, সক্রিয় ও উদ্যোগী তা প্রমাণ করা। এসব করতে গিয়ে নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন ও মনস্তত্ব ইত্যাদিকে সর্বোতোভাবে সমরূপ দেওয়ার প্রয়াস চালায়।

তৃতীয় পর্যায়ের নারীবাদী আন্দোলন অনেক সমালোচনার জন্ম দেয়। কিছু লেখিকা ঘোষণা করেন যে, এ আন্দোলন তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ার পরও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ইস্যু এখনও তেমন পরিবর্তন হয়নি। অধিকন্তু, নারীবাদীদের কেউ কেউ মেয়েদের যৌনতাড়িত আচরণ সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন যে, যৌনউদ্দীপক পোশাক, যৌনউত্তেজক নাচ, উঁচু হিল পরা, বিজ্ঞাপনে নারীর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ইত্যাদি কি নারীর প্রকৃত যৌন স্বাধীনতা ও লিঙ্গসমতার লক্ষণ? এমনকি পতিতাবৃত্তি নিয়েও নারীবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কেউ একে নারীর জন্য অবমাননাকর, আবার কেউ কেউ একে সমর্থন দেয়, নারীদের এক স্বতন্ত্র পেশা বলে দাবি করে।

নারীবাদী আন্দোলনের চতুর্থ ঢেউ

২০১২ সালের দিকে নারীবাদী আন্দোলনের চতুর্থ ঢেউ শুরু হয়। এর মূল ফোকাস ছিল যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ-সংস্কৃতির বিরোধিতা করা এবং সামাজিক মিডিয়াকে এ সমস্ত বিষয়ে উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজে লাগানো। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে একজন ভারতীয় তরুণী পাশবিকভাবে গণধর্ষণের শিকার হয় এবং পরবর্তী সময়ে সে মারা যায়। এ বিষয়টি ভারতে ও বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে। আবার দু'বছর পরে কথিত 'পুরুষ অধিকার' আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গেমারগেইট ক্যাম্পেইন শুরু হয়। এ প্রচারণার সারকথা ছিল সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলে নারীবাদীরা নিজেরাই ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে গিয়ে পুরুষদের ওপর চড়াও হচ্ছে। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে হিলারী ক্লিনটনকে হারিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন। ট্রাম্প কতকগুলো উত্তেজনাকর মন্তব্য করেন নারীদের সম্পর্কে। এর বিরুদ্ধে নারীবাদীরা প্রতিবাদ শুরু করে। ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-এর উদ্বোধনীর

পরের দিন নারীরা একটি মার্চের আয়োজন করে। ৪.৬ মিলিয়ন নারী এই মার্চে অংশগ্রহণ করে, যা আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো শোভাযাত্রা। এর চেয়েও গুরুতর আরেকটি বিষয় হচ্ছে মি টু আন্দোলন। আমেরিকায় এটি শুরু হয় ২০০৬ সালে। এর উদ্দেশ্য ছিল যারা যৌন নিপীড়নের শিকার তাদের সহায়তা করা। এ আন্দোলনটি ২০১৭ সালে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন মিডিয়া মোগল হারভে উইন্সটিন সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি বছরের পর বছর ধরে তার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর মেয়েদের ওপর বিনা বাধায় যৌন নিপীড়ন চালিয়ে আসছেন, তখন সারা দুনিয়ায় সব জাতির মধ্যে যারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা hashtag # MeToo ব্যবহার করে শেয়ার করা আরম্ভ করে। এ আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হয় এবং এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যে রাজনীতি, ব্যবসায়, বিনোদন ও সংবাদ মিডিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা মেয়েদের যৌন হয়রানী সম্পর্কে জানা যায়। ফলে ঐসব ব্যক্তিরা ভীষণভাবে নিন্দিত হন। সুযোগ পেলেই যে পুরুষরা মেয়েদের ওপর চড়াও হতে পারে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। এসব থেকে এটিও বোঝা যায় যে, বিয়েবহির্ভূত নারী-পুরুষের একান্ত সান্নিধ্য কোনো সময়ই নারীর জন্য কল্যাণ ডেকে আনেনি। মি টু আন্দোলন এটিই দেখিয়ে দিয়েছে। এখনও মি টু আন্দোলন অব্যাহত আছে।

নারীবাদী আন্দোলনের ধারা

প্রায় দু'শ বছর ব্যাপী পরিচালিত নারীবাদী আন্দোলনের প্রধানত তিনটি ধারা লক্ষ করা যায় : ১. লিবারেল বা উদারনৈতিক নারীবাদী আন্দোলন, ২. নৈরাজ্যবাদী চরমপন্থী নারীবাদী আন্দোলন ও ৩. মধ্যপন্থী নারীবাদী আন্দোলন।

১. **উদারনৈতিক ধারা:** উদারনৈতিক নারী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতাকাঠামোতে পুরুষের সাথে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা সংরক্ষণ করা। নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান ধারা এটিই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার ও বিশেষ সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করাই নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

২. **নৈরাজ্যবাদ প্রভাবিত চরমপন্থী নারীবাদী ধারা:** চরমপন্থী নারীবাদী আন্দোলনের বক্তব্য হচ্ছে যে, বর্তমান সমাজ, পরিবারপ্রথা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামো বজায় রেখে নারীর মুক্তি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারীসমাজের

মুক্তির জন্য পরিবারপ্রথা, বিয়ে, পারিবারিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিলুপ্ত করতে হবে। সমকামী নারীরা পুরুষের সঙ্গ ছাড়ার জন্য জোর দাবি তুলে। তাদের মত হচ্ছে, পুরুষকে ভালোবাসলে, পুরুষকে বিয়ে করে ঘরসংসার করলে নারীরা দাসত্ব কখনই দূর হবে না। তাই তারা প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে, সংসার ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। তারা নারীকে পুরোপুরি পুরুষের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। পুরুষের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা এমনভাবে নারীবাদকে উপস্থাপন করেছে যাতে মনে হয় যে, সমাজ শুধু নারীদের, এখানে পুরুষরা অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত। এটি যে নিছক পুরুষবিদ্বেষী একটি ধারা স্পষ্ট। এটিকে নারীবাদ বলার চেয়ে পুরুষবিদ্বেষবাদ বলাই ভালো।

৩. **মধ্যপন্থী ধারা:** তৃতীয় ধারাটি হচ্ছে মধ্যপন্থী নারীবাদী আন্দোলন। এরলক্ষ্য হচ্ছে, নারী-পুরুষ সমরূপ ও একদম একই-এ ধারণা পরিত্যাগ করা। নারীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতিতে অনেক মিল থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিলও আছে। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে যে নারী ও পুরুষের পার্থক্য সুস্পষ্ট তা স্বীকার করেই নারীদের অধিকার আদায় করতে হবে। নারী বা পুরুষ কেউ কারো মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। নারী-পুরুষ নিয়েই সমাজ, এরা পরস্পর সহযোগী, প্রতিযোগী নয়; একে অন্যের অংশীদার, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তাই নারীকে পুরুষ হওয়ার চেষ্টা পরিহার করাই উত্তম ও কল্যাণকর। আর এসব মেনে নিয়েই যে নারীবাদী আন্দোলন, তা-ই মধ্যপন্থী ধারা।

নারীবাদী আন্দোলন কার্যত পশ্চিমা ঔপনিবেশিক মানসিকতাপুষ্ট আন্দোলন

নারীবাদী আন্দোলন পাশ্চাত্যে শুরু হয়। পাশ্চাত্যের নারীদের অধিকার আদায়ের জন্যই তাদের এই আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী কালে এটি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নারীদের অগ্রাধিকার নির্ণয়, নারীদের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হয়। প্রাচ্যেও নারীদের অগ্রাধিকার যে ভিন্ন কিছু হতে পারে, তা পাশ্চাতের নারীবাদীরা বুঝতে নারাজ। পশ্চিমা নারীবাদীরা এশিয়া-আফ্রিকার নারীদের সমস্যা বুঝতে অনেক ক্ষেত্রেই অপারগ। তারা পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার আলোকেই নারীদের সমস্যা বিবেচনা করেন। তারা এটা বুঝতে চান না যে, আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আগমনের পরই নারীদের অবস্থান ও মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। সেসব অঞ্চলে পিতৃতান্ত্রিকতার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদ,

উপনিবেশবাদ অনেক বেশি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমা নারীবাদীরা প্রাচ্যের নারীদের উদ্ধারকারী বলে ভাবতে শুরু করলো, অথচ পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদই প্রধান সমস্যা-এটা তারা বুঝতে রাজি নয়। বিশ শতকের শেষপাদে এসে প্রাচ্যের অনেক নারীবাদী বলতে শুরু করলো যে, পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা প্রাচ্যের নারীদের সমস্যা জানতে ও বুঝতে চায় না। তারা চায় তাদের সমস্যা আমাদের গলাধঃকরণ করাতে। পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের মূল অগ্রাধিকার হচ্ছে নিরাপদ যৌনতা, ব্যাপক কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার, পরিবারপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি, হিজাব বা মহিলাদের শালীন পোশাক থেকে মুক্তি, যেকোনো পোশাক তা অর্ধউলঙ্গ হোক না কেন তা পরার অবাধ অধিকার ইত্যাদি। আর প্রাচ্যের নারীবাদের মূল দাবি হচ্ছে, নারীদের মর্যাদা অর্জন, পেশাগত সুবিধা লাভ, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ইত্যাদি।

১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করে যে, নেকাব ও নারীর খতনাকে সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা ছাড়াই। অথচ স্বল্পোন্নত দেশের প্রধান সমস্যা নেকাব বা নারী-খতনা নয়, আর্থসামাজিক বিষয়াবলি।

একইভাবে ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তৃতীয়বিশ্ব থেকে আগত মহিলারা প্রতিবাদ করেন এ কথা বলে যে, সম্মেলনের এজেন্ডা ইউরোপ-আমেরিকানরা হাইজ্যাক করেছে। প্রতিবাদকারীরা আশা করেছিল অনুন্নতি কী করে মহিলাদের পিছিয়ে দিচ্ছে তা আলোচনা করা। তার পরিবর্তে সম্মেলনের আয়োজকরা জন্মনিয়ন্ত্র ও গর্ভপাতকে প্রধান এজেন্ডা করেছে, যা তৃতীয়বিশ্বের মূল বিষয় নয়। যেখানে আমাদের সন্তানরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যুদ্ধের ফলে মারা যাচ্ছে, তা পাশ কাটিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত ইস্যু আমাদের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। নারী সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে তৃতীয়বিশ্বের শিশুসংখ্যা হ্রাস করাই পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য। অথচ পশ্চিমা দেশগুলোই বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদই ভোগ ব্যবহার করছে, প্রাচ্যের লোকেরা নয়।

বেইজিংয়ে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে আমেরিকান-ইউরোপীয় নারীরা জন্মদানের স্বাধীনতা ও যৌনভিত্তিক অধিকারের বৈষম্যকে বেশি গুরুত্বদিয়েছে যেখানে কম উন্নত দেশগুলোর জন্য বেশি প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ঋণ পুনঃতফসিল করা এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন। মূলত এশিয়া ও আফ্রিকার